Vol. 58 | No. 1-2 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ শামসুল হকের 'বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা': পালাবদলের কাব্যিক দলিল

Volume	58
Issue	1-2
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Kabir Ahmed
Published online	February 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i1-2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.10
Pages	২০৫-২২১
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সৈয়দ শামসুল হকের *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*: পালাবদলের কাব্যিক দলিল

Check for updates

কবির আহমেদ

সাহিত্য পত্রিকা
Shahitto Potrika

eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 1-2
February 2023

সাহিত্য পত্রিকা: ফাল্গুন ১৪২৯ (২০২৩)
বর্ষ: ৫৮ সংখ্যা: ১-২ পৃষ্ঠা: ২০৫-২২১

DOI 10.62328/sp.v58i1-2.10

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সৈয়দ শামসুল হকের *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*: পালাবদলের কাব্যিক দলিল

কবির আহমেদ*

সারসংক্ষেপ: পঞ্চাশের দশকের প্রতিশ্রুতিশীল কবি সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫- ২০১৬) *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* (১৯৭০) নান্দনিক শব্দশিল্পের সাম্রাজ্য। আত্মজৈবনিক স্বীকারোক্তিমূলক কবিতার আঙ্গিক অনুসরণ করে রচনা করেন *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* (১৯৭০)। এ কাব্যে বিষয়ান্তর ঘটে পাকিস্তান-উত্তর বাংলাদেশ, কবির পারিপার্শ্বিকতা, নিজের বেড়ে ওঠা, উপলব্ধির ব্যাপ্তি – এসবের রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। উত্তম পুরুষের জবানিতে সমকালের অনুসূক্ষ্ম নানাদিক এ কাব্যের উপজীব্য হয়েছে পয়ার ছন্দে লেখা পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে। এ কাব্যটিতে স্থান পেয়েছে বহির্জাগতিক বস্তুবিশ্ব নিয়ে একজন প্রাজ্ঞ কবির ধারণকৃত সময়জ্ঞান ও জগৎ। কাব্যটি পেয়েছে ভিন্নমাত্রিক বৈচিত্র্য ছন্দ হিসেবে চৌদ্দমাত্রার অক্ষরবৃত্তের গদ্যস্পন্দনকে বেছে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে। তৎকালীন সময়ের দেশীয় বহুমাত্রিক সংকটের মধ্য দিয়ে কবির চোখে দেখা নানামাত্রিক চিত্র আমরা এ কাব্যে অনায়াসে খুঁজে পাই। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে কীভাবে পাশ্চাত্য বৈদগ্ধ্য আর আধুনিকতা আমাদের কবিতাকে ঋদ্ধ করে তুলেছিল এ কাব্যটি তার স্মারক। এক অনন্য হৃদগত সৃষ্টি *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* (১৯৭০)। কাব্যটির বিশ্লেষণই এ প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারী* (১৯৫৩) সংকলনের অন্যতম কবি সৈয়দ শামসুল হক। সামগ্রিক কাব্য পরিক্রমায় তিনি রোমান্টিক অথচ সমাজ ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধ কবি। পঞ্চাশের অন্য কবিদের মতোই তিনি তিরিশের আধুনিকতার যোগ্য উত্তরসূরি। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ও যৌনচেতনা সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় প্রগাঢ় ছাপ ফেলেছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ *একদা এক রাজ্যে* (১৯৬১) তাঁর আত্মভাবনাজাত স্বকীয় কাব্যভাবনার প্রকাশ ঘটে। সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যে ব্যক্তির স্বাতন্ত্রিক ছাপ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কাব্য পরম্পরায় তাঁর শুরুটা হয়েছিল আত্ম-উন্মোচনের মধ্য দিয়ে। কবির স্বীকারোক্তিতে সে কথার প্রমাণ মেলে। *একদা এক রাজ্যে* ব্যক্তি-উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়, *বিরতিহীন উৎসব* (১৯৬৯) হয়ে *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* পর্বে এর পূর্ণ সার্থকতা। কবির ভাষ্য:

> এই ক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যাবে ১৯৫৬-১৯৬৪-এর ভিতরে লেখা নিয়ে আমার প্রথম দুইটি কবিতার এই একদা এক রাজ্যে ও বিরতিহীন উৎসব-এর অধিকাংশ রচনায়। আরো খানিকটা এগিয়ে এখানেই বলে নিতে পারি, আমার ভিতরে এই যে, কাজটি চলছিল তা অগ্রসর হচ্ছিল আর মাত্র কয়েক বছর পরেই লেখা *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*'র দিকে। (সৈয়দ শামসুল, ২০০৫: ২৫১)

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আত্মজৈবনিক উচ্চারণকে সামষ্টিক সমাজসত্যের দর্পণ করার কুশলতা বিধৃত *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* কাব্যটিতে। এই কাব্যের জন্য সৈয়দ শামসুল হক 'আদমজী সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন। ১৩৭৬ সনের বৈশাখ মাসে *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* কাব্যটি রচিত হয়। মূলত এটি একটি দীর্ঘকবিতা, একজন কথকের স্বগতোক্তি বিশেষ। কবি এ কাব্যটিতে ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য, উদ্‌ভ্রান্তি, ক্ষয়, অবসাদ, নেতি, বিবমিষা, রিরংসা, দেহ, ঐতিহ্য, বিকার ও বিক্ষোভকে সমকালীন জীবনের পটভূমিতে স্থাপন করে প্রকাশ করেছেন। শৈল্পিক বোধ আর শব্দ সচেতনতার কারণে তাঁর কাব্য নিজস্ব রূপাবয়ব নিয়ে গড়ে উঠেছে। নারী, প্রেম, রিরংসা, আত্মবেদনা, অসংগতি, ইতিহাস, মিথ, সমাজ এবং পার্থিব বহুমাত্রিক বিষয়কে একাকার করে স্বীয় কবিত্ব-শক্তি ব্যবহার করেছেন সামগ্রিক জীবনের দ্যোতনাকে রূপ দেবার জন্য। পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশকে আমাদের দেশের যে বাস্তব পরিস্থিতি ছিল; সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে যে পরিস্থিতি ছিল তার ভেতরে একজন সৃষ্টিশীল তরুণ সে কীভাবে তার দিন যাপন করছে, কীভাবে বিনিদ্রতার মধ্যে তার রাত কাটছে এই কথাগুলো বলবার চেষ্টা করা হয়েছে কাব্যটিতে। সেই সময়কার চারদিকের একটা ছবি নিশ্চয়ই লক্ষ করা যায় এ কাব্যে। এক অর্থে এটি হয়ে উঠেছে সেই সময়কার কবির জীবনী।

আধুনিক কবিতার একটি মৌলিক উপাদান কাব্যস্রষ্টার নিজের সত্তা। কবিতায় এ সত্তার বহুমাত্রিক উৎসারণ ঘটে। সৃজনীশক্তিতে অনন্য সৃষ্টিশীল কবি প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আবিষ্কার করেন । ভাব, বোধ, কল্পনা আর প্রাতিস্বিক প্রতিভার সমন্বিত উপস্থাপনে ব্যক্তি কবির আবেগ-সংরাগ আর মানবিক প্রবণতা শৈল্পিক সুষমার সংস্পর্শে কবিতা হয়ে ওঠে। আত্মকথন আর আত্ম-অনুভবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উচ্চারণ মূর্ত হয়ে ওঠে নাক্ষত্রিক মহিমায়। যে সত্তা-অস্তিত্বকে কবি উপলব্ধি করেন, সেখানে তিনি কবি, শিল্পী আর প্রেমিক। এ ত্রিবিধ সত্তার সন্নিপাতে মোহন এক বাগভঙ্গিমার জন্ম হয় কবিতায় যেখানে কবি নিজেকে বারবার ফিরে পান আর জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত সব অনুষঙ্গকে সূক্ষ্ম বোধজাত অনুভূতিতে রূপান্তর ঘটান। কবিতা হয়ে ওঠে প্রাণের স্পন্দন। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর বর্ণাঢ্য সৃজনচঞ্চল জীবনে কবিতার সৌকর্যবোধ ও শিল্পসুষমাবোধ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। দীর্ঘ এ কবিতাটিতে কবি প্রথমত একটি দ্বিধার কথা বলেন, যেখানে একটি ইঙ্গিতময় বাণী সুস্পষ্ট। দ্বিধাবিভক্ত কবির মানসপটটি উন্মোচিত হয়। প্রাত্যহিক জীবনের নানা সূক্ষ্ম উপাদান কবিকে অনিবার্যভাবে আন্দোলিত করে যেন তারা অক্ষরের ঘাড়ে ভর দিয়ে বেজে উঠতে চায় চরণে চরণে। কবির উচ্চারণ:

> বহুদিন থেকে আমি লিখছি কবিতা,
> বহুদিন থেকে আমি লিখি না কবিতা;
> লিখিনি কবিতা পূর্বে, পরে, বর্তমানে?
> তাহলে একে কি বলি? এই যা লিখেছি

শোকগ্রস্ত জননীর মতো? বাক্যরোলে
শাসন বারণ নেই, কি তবে এগুলো?
... ...
বুঝিনা অক্ষরগুলো বলতে কি চায়?
কেন তারা বেজে ওঠে চরণে চরণে?
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১১৮-১১৯)

শিল্পীর সত্তা নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। শিল্পী নিজেই সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নিজের অভিপ্রায়। সামূহিক জীবনের অভিজ্ঞতার সারৎসার নিয়ে তিনি তৈরি করেন নিজের চলার পথ। নিজস্ব বোধ, সজ্ঞা, অভিজ্ঞান আর অভিপ্রায়কে সঙ্গে নিয়ে নির্মাণ করেন তার শৈল্পিক চেতনা। গড়ে তোলেন স্বতন্ত্র বহুবর্ণিল এক জগৎ। ভাষার চমৎকারিত্ব আর অনুভবের কারুকার্যে সৃষ্টি হয় তাঁর কবিতা। কঠিন পরিমিতিবোধের দেয়ালে আবদ্ধ থেকেও কবি জীবনের বীজমন্ত্র তুলে নেন স্বকালকে ধারণ করে। কবিতা হয়ে ওঠে জীবনবেদ। কবির উক্তি:

কবিতা কি আপন ভাষণ? দুই হাতে
মাইকের মুখ সবলে আঁকড়ে ধরে
শূন্য সভাঘরে, শরীরে ভীষণ জ্বর
কিন্তু রোম পুড়ছে কোথাও, যা বলার
বলা তাই অসমাপ্ত বাক্যে, অনুপ্রাসে?
অস্তিত্বের চক্রে চক্রে অর্থের সন্ধান?
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১১৯)

শিল্প, সাহিত্য, জীবন, মনন আর জীবনের যন্ত্রণাময় সংকট ধরে রাখার জন্য পঙ্‌ক্তি রচনা করেন তিনি, তাঁর সাথে মিশে যায় নগরমনস্কতা। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত কবি, সে কারণেই তার কবিতায় নগরমনস্ক অনুভব বোধ-আচার সহজে ধরা পড়ে। আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা, ক্লান্তি, নিঃসঙ্গতা ও অনবরত অবসাদের চিত্র রয়েছে কাব্যটিতে নিরাসক্ত জীবন যেখানে খুঁজে পায় না স্বস্তি। সদর্থক জীবনবোধ এখানে অনুপস্থিত। কবির ভাষ্য:

বহুদিন থেকে আমি লিখি না কবিতা।
অধুনা তাদের দেখি চিত্রিত মুখোশে
জ্বলন্ত বর্ণের জামা পাজামা জুতোয়
হেটে আসে রেস্তোরাঁয় পার্কে, পত্রিকায়,
ফ্ল্যাটের বিবরে। সম্প্রতি যুবক যারা
চাষ করে নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণার তিসি,
কবিতা তাদের ঘরে যে যেমন সাজে -
কাসান্দ্রা, রোমেল, জিন্না, যাত্রার বিবেক।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১১৯)

কাব্যস্রষ্টার সত্তা সবার থেকে আলাদা। পৃথিবীর সামূহিক যন্ত্রণা তাঁকে আক্রান্ত করে, পীড়িত করে,

বিষাদে ভরিয়ে তোলে। জীবনের নির্বেদ আর যন্ত্রণায় আমূলবিদ্ধ কবিকে তৈরি করে নিতে হয় কণ্টকাকীর্ণ ভূমে নিজের সত্তা। সাময়িক জীবনের নানা ক্লেদাক্ত দিক, সামাজিক অস্থিরতা, ব্যক্তি মানুষের নিঃসঙ্গতা, কামুকতা আর সার্বিক মানবিক বিপর্যয়ের ভেতরে একজন কবির সত্তা কিভাবে নির্মিত হয় তার নিখুঁত রূপায়ণ এ কাব্যটি। প্রাসঙ্গিক উচ্চারণ:

প্রথমে করব জয় সুরূপা, বিরূপা;
তারপর পরিবার, যারা রোজ বলে,
'কবিতার সরোবরে ফোটে অনাহার,
ছেঁড়া চটি, শস্তা মদ, আসক্তি বেশ্যায়';
তারপর বাংলাদেশ, এশিয়া, আফ্রিকা;
ফর্মায় ফর্মায় ক্রমে বেড়ে উঠে হবে
কবিতার সংকলন খদ্দরে বাঁধানো,
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১২০)

কবি উপলব্ধি করেন কবিতার তাৎপর্য, নান্দনিকতা। সৈয়দ শামসুল হক তাঁর নিজের জীবনে কবি হয়ে ওঠার এ দীর্ঘ কবিতায় উচ্চারণ করেন সেই সত্য। যার উচ্চারণ সহজ কিন্তু রয়েছে উপলব্ধির কাঠিন্য। আর শিল্পীসত্তার অন্তর্নিহিত গহন থেকে নির্মিত হয় কাব্যের শরীর। কবির উচ্চারণ:

সরল রৈখিক নীল কঠিন ইস্পাত
হয়তো নোয়াতে পারো। কিন্তু কবিতার
সাথে নদীর তুলনা কেউ কেউ দিয়ে
থাকলেও আসলে সে স্বপ্ন-ভাগীরথী
শরীরে ধরে না জল। তরল হীরক
প্রতিভা সরোবর থেকে কলকণ্ঠে
নেমে আসে পিঙ্গল জটায়, পৃথিবীকে
শস্যের সংবাদ দিয়ে অন্তর্গত হয়
লোকে লোকে স্মৃতির সাগরে। একাডেমি,
বিশ্ববিদ্যালয়ে, ত্রৈমাসিক পত্রে, গিলডে.....
(সৈয়দ শামসুল: ২০০৮: ১২৩)

নগরমনস্ক মধ্যবিত্তীয় মানসের প্রাতহিক জীবনচিত্র, শাহরিক কবিদের জীবন-যাপন আর

শিল্পসৃষ্টির বহুমাত্রিক পর্যায়কে কবি ধারণ করেন নিজের উপমায়। নগর মানুষের প্রতিচিত্র বিম্বিত করেন কবিচিত্তে রোমান্টিক ভাব অনুভবে। এ নাগরিক বর্ণনায় কবিচিত্তের দহন সুস্পষ্ট। স্বদেশের, স্বকালের সমস্ত অসঙ্গতি কবিকে পীড়িত করে । সবার সামনে ভদ্রলোক রাতের অন্ধকারে নৈতিক স্খলনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, পরিণত হয় আলাদা জীবে। সমাজ মানুষের এই অধঃপতনে তরুণ কবি নিজেকেও শামিল করেন সেখানে, নিজেই উপাদান সংগ্রহ করে চলেন, শুষে নেন জীবনের উত্তাপ। মূলত নিজের চেতনা ও চরিত্রকে কবি যেভাবে নির্মমভাবে অনাবৃত করেছেন তাতে যুগমানস এবং ব্যক্তিমানসের ক্ষয়িষ্ণুতার চিত্র প্রকট হয়েছে। আধুনিক মানুষের জটিল মনোভঙ্গি, আশা-আকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশকণাকে কখনো চেতন কখনো অবচেতন জগতের আবরণে প্রকাশ করেন কবি। সমকালীন সমাজজীবন ও সমাজমানসের অবক্ষয়ের রূপটি প্রকাশ করেন কবি এভাবে:

ঠা-ঠা রোদে মেম ফুটপাথে, প্রতিদিন
মেয়েদের পাজামার ছাঁট বদলায়,
উদ্‌যাপিত হয় জন্ম রবীন্দ্রনাথের,
পৈতৃক তন্দুরে সেঁকে আবদুল্লা রুটি।
...   .
'ইউ আর হোপলেস স্যার। দশ টাকা
বেশি দিতেন। তবু শস্তা। এই দামে
বলুনতো ভদ্রযোনি কোথায় পেতেন?'
প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা, সেও এই ভীড়ে;
...   .
এরকম মনে হয় কিনা। সিগারেট
রোল যেন ক্ষিপ্র হাতে কবিতা বানাই।
জলমগ্ন সব, আমি ব্যতিক্রম নই।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১২৮-১২৯)

সামাজিক অস্থিরতা আর এই হতাশার অবস্থা বদলে যায় দ্রোহে, বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাতে। দ্রোহচেতনা কবিকে করে তোলে বিদ্রোহী, প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে বিদ্রুপাত্মক। বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক রুগ্নতার চিত্র কবিকে ক্লিষ্ট করে। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবক্ষয় যুবমানসকে স্পর্শ করেছে। ফলে উদ্যমহীন ও আদর্শহীন জীবনে উৎকেন্দ্রিক মনোভবের জন্ম হয়। মূলত *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* কাব্যটি তৎকালীন বাংলাদেশের অগ্নিঝরা সময়কে ধারণ করে। এক অস্থির সময়কে ধারণ করে তাঁর কবিতা। নিজের সৃষ্টিশীল কবিজীবন আর বাংলার সার্বিক অবস্থান একাকার হয়ে যায় তাঁর কবিতায়। কবি লেখেন:

... রবীন্দ্রনাথের
গানে বাংলার কি হয়, কিভাবে হৃদয়
ভাঙে, নড়ে ওঠে স্বপ্নের বোমারু, জোড়া
লাগে রুপালি দরোজা, অলৌকিক স্পর্শে
নতুন গর্ভের মতো ফুলে ওঠে পেট
এ সব সংবাদ কারো অপেক্ষা রাখে না।
বাংলাকে নিজের তুমি করবার আগে,
লোকে বলে, হয়ে যাবে তুমি এ বাংলার
খররৌদ্রে, অনশনে, বিপ্লবে, প্লাবনে,
সাপের আড়তে, নীল পাখির চিৎকারে
লোকগুলো গলুয়ের চোখ হয়ে যায় ।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩১)

স্বদেশের বুকে নেমে আসে প্রতিক্ষণে দুর্যোগ-দুর্বিপাক। কিন্তু সবকিছুতে স্বাভাবিকতার আস্তরণ পড়ে, মানুষ গতানুগতিক প্রাত্যহিকতায় গা ভাসায়, থাকে না কোনো চঞ্চলতা –

কিন্তু আমি ভূতগ্রস্ত লিখে যাই আজো
বাতিল খামের পিঠে, কিংবা মনে মনে,
ঘরে ফিরে বাঁধানো খাতায়, রেস্তোরাঁয়
হঠাৎ আউড়ে উঠি $cO\&w^3$ সদ্যোজাত
... ...
আর দেখি, কিছুতেই আসে না যায় না
কিছু, যেমন সমস্ত ছিল অবিকল
তা-ই আছে। ফিরে আসে বাংলায় বিদ্রোহ
নিয়মিত বছরে বছরে। যায় লোক
সস্ত্রীক শ্বশুর বাড়ি ঈদের ছুটিতে।
... ...
উপমা ভোলায় ঘুম, চিত্রকল্প নেশা;
শব্দ হয় সদ্য দেখা মেয়েটার মতো,
তার সাথে অন্ধকারে লম্বমান হই
ঠোঁট চুষি, শিহরাই, ত্বকে লোমকূপে
রকেট নিলীমা ছেঁড়ে। আজো লিখে যাই।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১২৬ - ১২৮)

একজন কবির দৃষ্টি সর্বত্রগামী। সৈয়দ শামসুল হক মাটি ও মানুষের কবি। বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি তাঁর কবিতায় উদ্ভাসিত করেছেন বহুবর্ণিল অনুষঙ্গে। তিনি দেখেছেন বাংলার

জীবনচিত্র, নৈসর্গিক পরিবর্তন। সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তন এবং দেশবিভাগের নিখুঁত চিত্রাঙ্কন করেছেন এই কাব্যে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হলে বাঙালির একটি অংশ ভারতে চলে যায়। দীর্ঘ এই কবিতায় কবি দেখিয়েছেন আমাদের ভাঙন। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভাঙন তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করে। কাব্যবোধে জারিত কবি সৈয়দ শামসুল হক; তাই শিল্পীসত্তা তাকে মুক্তি দেয় না। এদেশের মাটি, মানুষ, নিসর্গ কবির শিল্পীসত্তার সাথে অঙ্গীভূত। এ দেশের জল-বাতাস-প্রকৃতি গড়ে তুলছে তার মনন। ফলে সামগ্রিকভাবে বাঙালির মন ও মননে যে পরিবর্তন ঘটে তা কবি রূপ দেন তাঁর কাব্য প্রতীতিতে -

তুমি নীল সুটকেশে বয়ে এনেছিলে
কুড়িগ্রাম থেকে তার ক্রুদ্ধ ধরলার
একটি কল্লোল আর আকন্দের পাতা
আর শ্যামলের ছবি।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩৩-১৩৪)

কবি তাঁর কাব্যচেতনাকে উন্মিলিত করে লেখেন -

আবার নতুন প্রেম, নতুন পানীয়
ভোজ; টুলশপে কত না নতুন যন্ত্র-
দাঁত আমি আবিষ্কার করেছি বিস্ময়ে।
কিন্তু সেই লাল ক্ষত সারে নি আমার
জ্যোৎস্নার আঙুলে চাঁদ চুলকে দিয়েছে তা
প্রতিভার পূর্ণিমাতে, কালীদহে ডুবে
মরেছে যে বধূ তার গলায় দেখেছি
জলের মুক্তার হার, আমি তার স্বামী
আজীবন বসে আছি পাষাণ পৈঠায়।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩২)

'মানুষ' এবং 'জীবন' এই দুই প্রত্যয়ই সৈয়দ শামসুল হককে মহান কবির মর্যাদা দান করেছে। তিনি মানবীয় বোধে উজ্জীবিত হয়ে পৌরাণিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করেন। ভারতীয় পুরাণের মনসা হয়ে উঠে বিপ্লবের প্রতীক। কবির ভাষ্য:

আমারও সংসার হবে -
শিল্পের সংসার। চন্দ্রবর্তী হবে বোন,
কালীঘাটে আত্মীয় আমার। আমি জানি
মনসার ক্রোধ মানে মানুষের জয়
চাঁদ রাজা হার মানে। লৌহ বাসরের
কালছিদ্রে চোখ রেখে আমি কালরাতে
পূর্ণিমা ধবল দেহে আজো জেগে থাকি।
(শামসুল, ২০০৮: ১২৫)

স্বাপ্নিক শহর ঢাকা, বিপণি বিতান, মহাসড়ক, নতুন পথ, ঝকঝকে পিচ, যেখানে 'এক ঝাঁক

মেয়েদের মতো হাসতে হাসতে ছুটে যাচ্ছে গাড়ি', পাবনার শাড়ি, চমচম, সর্ষে তেল, বাজারের সেরা ক্রিম, নামী হাতঘড়ি-সব কবিকে বিস্মিত করে। ভেতরে জন্ম হয় বোধের নতুন মহাদেশ। পারিপার্শ্বিক সবকিছুতেই তিনি দেখেন নির্লিপ্ত দ্রষ্টার মতো। কবি শাহরিক জীবন কাঠামোকে জানেন অন্তরঙ্গভাবে। ভাষা নির্মাণে, শব্দের নিপুণ বিন্যাসে, শাহরিক নিরেট বস্তুবর্ণনায় সৈয়দ শামসুল হকের সাফল্য ঈর্ষণীয়। নাগরিকবোধ-সঞ্চালিত বাক্যবিন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে তাঁর কাব্য। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের জীবনধারাকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন কবি -

রাস্তায় বেরিয়ে আজ আমি দেখলাম
একটি নতুন পথ, ঝকঝকে পীঁচ,
... ...
বিপনী-ফলক বাক-বাকুম করছে,
স্বপ্নের তামাক যেন টেনেছে শহর।
... ...
শেফালি হুমড়ি খায়, ব্যানার্জীরা যায়,
থেমে যায় মন্দ্রগান পটুয়াটুলীতে
আর অলৌকিক জায়নামাজের মতো
কার শয্যা হু হু করে বেড়েই চলেছে।
তারা বুঝতে পারে না। ইসলামপুরে,
নাজিরাবাজারে আর সাতরওজায়,
নারিন্দায় বারান্দায় বসে অবেলার
তন্দ্রায় ঝিমোয় তারা, মাঝে মাঝে দেখে –
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩২-১৩৩)

একজন কবি তার কবিতা রচনার পটভূমি ও বিষয় নাগরিক অনুষঙ্গ থেকেই সংগ্রহ করেন। কবির সহজ স্বীকারোক্তি:

রেস্তোরাঁ, পত্রিকা, কফি, সিগারেট, ছবি
তার গলা টেলিফোনে, কড়া শাদা জামা,
দুপুরে হঠাৎ জলে নামবার সাধ,
সতর্ক দোকান থেকে চুরি করে আনা
কোনো কবিতার বই, আপন মৈথুন,
পকেটে কবিতা যেটা দুপুরে লিখেছি।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১২০)

দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিকতায় কবি যাদের সংস্পর্শ পেয়েছেন, তাদের নাম ব্যবহার করেছেন

ছান্দিক দক্ষতায়, কাব্যিক মাধুর্যে। নিগূঢ় সারল্যে, অকপট কথা পরম্পরায় এই কাব্যিক রূপায়ণ আমাদের বিহ্বল করে; বিমুগ্ধ পাঠককুল এক নাগরিক কবিকে চিহ্নিত করে মানুষের মনের গহন প্রদেশে যাঁর অনায়াস আরাধ্য; প্রতীক-ভাব-ভাষা-ছন্দে যিনি অকপট; গহিন উচ্চারণ যাঁর কবিত্বশক্তির চূড়ান্ত পারদর্শিতা। কবি লেখেন:

তুমি, নিঃশব্দে পালাবে, সিগারেট ভুলে
রেখে যাবে। খালেদ খুঁজবে এসে,
'আছে
নাকি সুকুমার? অথবা সঞ্জীব দত্ত?'
'জানি না, দেখিনি।'
'বিশুদ্ধ সংখ্যার ছকে
খেলি আয় অস্তিত্বের খেলা।'
... .
রাস্তায় ভূতের মতো প্রসারিত হাত
প্রহ্লাদের। শামসুর রাহমান ফিরে
একবার দেখবে তোমাকে। তারপর
হেঁটে হেঁটে নীল-খুরে সূক্ষ্ম ধূলি তুলে
চলে যাবে চন্দ্রের শহরে ।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩৬-১৩৭)

কবির ধারাবাহিক জীবনপ্রবাহ, সমগ্র বাংলাদেশের তৎকালীন সামগ্রিক সাংস্কৃতিক, সামাজিক অবস্থা তিনি ক্রমাগত শব্দ প্রবাহের মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছেন শৈল্পিক কারুকার্যে। বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের কবিকুল নিয়মিত আড্ডায় মেতে উঠতেন বিউটি বোর্ডিংয়ে, তার কথাও কবি ব্যক্ত করেন এভাবে

রোজ দাঁড়িয়ে থেকেছ। সেই শিংটোলা
তোরণের পাশে আড্ডা বিউটির মোড়ে,
কিছু দূরে নর্থব্রুক হল রোডে গিয়ে
গোবিন্দ-র বারান্দায়, নবাবপুরের পর
এভেনুয়ে কফি খানা কাবার ভেজা
ফুটপাথে, নীলাচলে, অশ্রুর দেয়ালে,
ভিয়েতনামে, মুলারুজে, মিশৌরি জাহাজে।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩৭)

সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন লক্ষণকে তাঁর কবিতায় ধারণ করেছেন।

নাগরিক সমাজের এ সমস্ত নারী পুরুষ চরিত্রেরা একদিকে যেমন নাগরিক বাস্তব জীবনে অঙ্গীভূত, অন্যদিকে বাংলাদেশের সাময়িক বাস্তবতার নানামুখি বিবর্তনকে সাঙ্গীকরণ করে। স্বভাবতই এই চরিত্রেরা বিভিন্ন মাত্রার পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়ায় উৎকণ্ঠিত, গভীর সংকটে নিপতিত এবং আত্মিক সংকটে বিকারগ্রস্ত। জীবনবাস্তবতায় কখনো তারা দিশেহারা এবং এর সঙ্গে যোগ হয়ে যায় মানবিক নানা প্রবণতা-প্রেম, ভালোবাসা, অভিমান-ক্ষুব্ধতা, যা কখনো জৈবিক তাড়নায় গ্লানিময় জগতে নিয়ে যায়। অসংগতিপূর্ণ, অসামাজিক নাগরিক জীবন বাস্তবতা কোনো সুস্থ মানবিক চেতনার ব্যক্তিকে স্থির থাকতে দেয় না, তাকে নিয়ত ক্ষতবিক্ষত করে। ব্যক্তির নৈরাশ্য, খেদ, আর্তনাদ সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় রূপকে প্রতীকে ছন্দে এমনভাবে ধরা দেয় যে তা আর কবির একার থাকে না, আমাদের সকলের অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে। কবি বলেন:

> কবিতা আমার আত্মার চিৎকার; অস্তিত্বের কারণ জীবন তৃষ্ণার পানীয় এবং আয়নার সমুখে আমাকেই অবলোকন- এই সময় ও এই অনুভবের রঙে রেখায় আলোক-সম্পাত যে আমার মুখ। (সৈয়দ শামসুল, ২০০০: ভূমিকা)

ব্যক্তিমানুষের জীবনযাপন-জীবনবিন্যাস ও তার মগ্নচৈতন্যের কুয়াশা-ধোয়াশা রূপ লেখকের চেতনক্রিয়ায় যুক্ত থাকে। মানুষের অন্তর্লোক ও বহির্লোকে লালিত সংগ্রাম- সংরাগ, প্রেম-অপ্রেম, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস তাঁকে শিল্পসৃষ্টির প্রণোদনা দেয়। জনজাতির মানসলোকে আশ্রিত লোকপুরাণ, ইতিহাস আর কিংবদন্তির আলোছায়া মহৎ ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দেশকালের সমসাময়িক ঘটনার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সঙ্গে বহমান ঐতিহ্যের মিথস্ক্রিয়ায় কবির নির্মাণকলা সিদ্ধি লাভ করে পূর্ণতা পায়। আলোচ্য উপকরণ-জগতে সৈয়দ শামসুল হকের মানস পরিভ্রমণ গভীর, স্বতঃস্ফূর্ত ও ঋদ্ধ। তাঁর সৃজনচঞ্চল জীবনাভিজ্ঞতা তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে এক ধ্রুপদী মাত্রা এনে দেয়। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ক্লেদ-গ্লানি-প্রত্যাশা-প্রেম-প্রতারণা-বৈপরীত্য-বিচ্ছিন্নতা তিনি রূপ দেন কবিতায়। *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা* আত্মজৈবনিক কাব্যভাষ্যে শোনা যায় স্বপ্ন ও বিভ্রমের দ্বন্দ্বে পীড়িত এক উদ্‌ভ্রান্ত স্মৃতিভুক নীলকণ্ঠ কবির আত্মচিৎকার:

> মেরুদণ্ডে হিমবাহ বয়ে শহরের
> বুকে উত্তর দক্ষিণ আমি খ্যাপা ট্রাক
> বেরিয়েছি ছুটে। স্বপ্ন ও বিভ্রম ছুঁয়ে
> মেপেছি মুহূর্তগুলো পিসার গীর্জায়
> অবিরাম। রাত্রি গেছে রমণে বমনে,
> দিন বেড়ালের ঘুমে। একাকার হয়ে
> গেছে ডাবলিন ঢাকা। পুরানা পল্টনে
> উড়ে গেছি বারবার অ্যালবার্টসের বিশাল পাখায়।
> (সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৪০)

সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় মানব মানবীর শরীরী সৌন্দর্য ব্যবহৃত হয়েছে কখনো প্রেমের স্বরূপ ও তাৎপর্যকে ধরে রাখতে আবার কখনো তা জীবনের গভীর অনুধ্যানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি জীবনের প্রবহমানতা, স্বাভাবিক প্রবণতাকে অস্বীকার করতে চান না। তিরিশের দশকের কবিদের সাথে তাঁর উপলব্ধি ও বোধ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তিনি নবতর দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়োগরীতির পরিচয় দিয়েছেন। শরীরী উপস্থাপন ছাড়া জৈবিক তাড়নার প্রকাশ অসম্ভব। সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল স্থূল উত্তেজক দেহ বর্ণনা হয়ে পড়ে। বাংলা কবিতায় এটিকে অশ্লীলতার তকমা দেওয়া হলেও ইয়োরোপীয় সাহিত্যে প্রবল একটি ধারা। প্রেম-সংরাগ-কাম চেতনার প্রকাশকে একটি শোভন সূক্ষ্মতায় তুলে ধরেছেন কবি সৈয়দ শামসুল হক। জৈবিক তাড়নাকে শিল্পময় সূক্ষ্ম অনুভবে ঋদ্ধ করার কৃতিত্ব তাঁর কবিতা পড়লে বোঝা যায়। দেহ সংসর্গের বিষয়কে উপস্থাপনার গুণে, শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসের দ্বারা শিল্পময় করে তুলেছেন। অপ্রাপ্তিজনিত অবদমন শিল্পরূপ পেয়েছে তাঁর বহুমাত্রিক কবিতায়। সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যে প্রেম ও রিরংসাজনিত ভাবনা কেবল বাংলাদেশের কবিতায় নয় সমগ্র বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংরাগ-উচ্ছৃঙ্খল যৌবনের অমিতাচারকে তিনি এভাবে ব্যক্ত করেন:

...মনে পড়ে
শাদাপেট মেয়েটাকে, যাকে মনে করে
হামামে মিথুন করি। যাকে মনে করে
রসাতলগামী দ্রুত আঙ্গিকে ভাষায়
লিখি তাড়া তাড়া নোট। ভালো হতো, যদি
আমি সেই কিশোরের মতো সারারাত
রাস্তায় রাস্তায় গাঢ় আমার ছায়ায়
টেনে নিতে পারতাম চুল্লির আঁধার।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১২৬)

অন্য একটি দৃষ্টান্ত এরকম:

জলমগ্ন যে-কিশোর আমিও কি তার
সাথে পাল্টে নেবো জামা? সুবোধ বেশ্যার
স্তনে দুধ টেনে রাত করব কাবার?
শিশ্নের ফলায় আমি যোনিতে যোনিতে
লিখৰ কবিতা তবে? সুরার ফেনায়
স্মৃতির জাহাজতল মেখে নেব আমি?
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩২)

মূলত স্বপ্ন ও বিভ্রমের মধ্যে ডুবে আছে বাংলাদেশ, অজ্ঞানতা-অন্ধকার, কুসংস্কার আর সাম্প্রদায়িকতায়। ব্যক্তি কবির সত্তা সেখানে স্থির সমাহিত হতে পারে না, কেননা তিনি বোধের রূপকার। এক নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তিনি সব কিছু দেখেন, সময়কে অবলোকন করেন। তিনি কবিতায় নিরীক্ষা ও নবমাত্রা আরোপের উপর গুরুত্ব দিলেও স্বকালকে ধারণ করেছেন তাঁর

কবিতায়। নিজস্ব শিল্পজাত মণ্ডনকলায় ও অনুভবঋদ্ধতায় তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি সৈয়দ শামসুল হককে স্বতন্ত্র ও শক্তিমান কবি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নিজস্ব প্রতীতিজাত অনুভব তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে স্বকীয় নির্মাণ ধারায়। শিল্পের নন্দনতাত্ত্বিক বোধের স্বকীয়তা, অনুভবের গভীরতর সূক্ষ্মতা ও চেতনার নিজস্বতায় তাঁর কবিতা বাংলাদেশের কাব্যের ইতিহাসে নতুনমাত্রা যুক্ত করেছে। ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ আর গভীর আত্মানুসন্ধান তাঁর কাব্যের মূল জগৎ হলেও সময় আর স্বকালকে তিনি ধারণ করেন শৈল্পিক সুষমায়। কবির ভাষ্য:

> কবিতাই বটে; সময়ের অনুরণন, জীবন ভাবনা ও আত্মিক অনুভবের সবচেয়ে নিপুণ ও সাংকেতিক, প্রায় মন্ত্রতুল্য প্রতীক ও রূপনির্ভর প্রকাশ কবিতা। এরই জন্য আমার জীবনের শ্রম সফল। (উদ্ধৃত, শামসুজ্জামান, ২০১৮: ৮)

গভীর জীবনদৃষ্টি আর মানবিক বোধের ছটায় সামাজিক অধঃপাতকে তিনি কবিতার শরীরে এভাবে ধারণ করেন:

> নারিন্দার ব্রীজের তলায়
> গলাকাটা ভাইটাকে রেখে শিবতোষ
> চুঁচড়ায় গেছে। তার মন হু হু করে
> লক্ষ্মীবাজারের মোড়ে শেফালির ঘ্রাণে
> আনাচে কানাচে মাঝে মাঝে স্তব্ধ রাতে
> অভিগ্রস্ত তার পদশব্দ শোনা যায়।
> (সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩৮)

সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিবরণ দেন কবি এভাবে:

> পিতাকে যখন দেখি নত সেজদায়,
> কাফনের ঘ্রাণ পাই। প্রশান্ত, শ্যামল
> ডাকে। আবার পুড়তে থাকে মাঝিপাড়া
> কুড়িগ্রামে; দাঁড়ায় যুদ্ধের জীপ। ভোরে
> পরিমল পালায় ভারতে। দুর্যোধন
> কাড়ে সিংহাসন। বেশ্যার যোনিতে খুড়ি
> সুড়ঙ্গ স্বর্গের।
> (সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩০)

সৈয়দ শামসুল হকের এ কাব্যটি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তিনি মূলত নিজের সত্তা অস্তিত্বকে আবিষ্কার করে চলেছেন। সমালোচক বলেন:

> কবির এই অস্তিত্বচেতনা ব্যক্তিক এবং একই সঙ্গে সামাজিক বস্তুজগৎ ও মনোজগতের আকাঙ্ক্ষা। সূক্ষ্ম দৃষ্টি সঞ্চালিত করে কবি এই উৎস ও প্রেরণাকে অনুসন্ধান করেন, আবিষ্কারকে অনুভব ও মূল্যায়িত করেন এবং চৈতন্যের পরিকল্পিত প্রয়োগ সৃষ্টি করেন। (আজীজুল, ১৯৮৫: ৬)

জগৎ ও জীবন সর্বোপরি সময়কে দেখার নিজস্ব পদ্ধতিই তাঁকে কবি করে তোলে। ব্যক্তিজীবনের প্রবণতা প্রকরণ নিয়ত ধরে রাখতে চেয়েছেন কবি। কবির ভাষ্য:

> চিত্রকরের হাতে কখনো জল, কখনো তেল কি আক্রিলিক, কখনো পেন্সিল কি কালিতে গুয়াশে ছাপচিত্রে হয় আঁকা, এক হাতের কাজ হয়েও আপাত চোখে এই সব কতটাই না ওজনে ও ব্যঞ্জনে হয় ভিন্ন। ভাষায় লেখা কবিতা ও তেমনই এসেছে আমার কাছে কখনো জলরঙের মতো স্বচ্ছ, কখনো তেলরঙে ঘন, কখনো স্কেচের মতোই সংকেতময়, কিম্বা পেন্সিলের মুখে অস্পষ্ট-চঞ্চল। (শামসুল, ২০০৮: প্রসঙ্গ কথা)

সৃজনের ধ্রুবতারা সৈয়দ শামসুল হকের নিসর্গচেতনাকে প্রাচ্যের লোকজ উপাদান, প্রেমজ উপাদান এবং প্রাকৃতিক নানামাত্রিক অনুষঙ্গ ঋদ্ধ করেছে। বাংলার প্রকৃতি ও নিসর্গের সঙ্গে সৈয়দ শামসুল হকের রয়েছে নিবিড় যোগ, অবিচ্ছেদ্য সংযোগ। কবি বাংলার অনুকূল প্রতিকূল সবধরনের পরিস্থিতিতে নিসর্গের সান্নিধ্যে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের অস্তিত্বকে একসূত্রে গেঁথেছেন। তাঁর কাব্য প্রতিভার মৌলচেতনা অস্তিত্ব সন্ধানী মনোভাব থেকে জাত হলেও তাঁর কবিতা নিসর্গের দৃঢ়তাকে উপমা চিত্রকল্পে প্রতিফলিত করে শিল্পরূপে সমন্বিত হয়ে বাংলা কাব্যসাহিত্যে অনিবার্যভাবে স্থান দখল করে নেয়। প্রকৃতি ও নিসর্গ তাঁর কবিতায় এসেছে দৈনন্দিন কালাতিপাতে, কখনো বৈপরীত্যময় সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের বর্ণনসূত্রে, আবার কখনো স্মৃতি বর্ণনায়:

> হঠাৎ দেখতে পাই কালবৈশাখের
> ঝড় ফেটে পড়ে তীব্র চাপা আর্তনাদে ।
> বাতাসের হাহাকারে, নৌকোয় নৌকোয়
> দোলে, ডেমরায় শন্‌ শন্‌ ঘোরে, ওঠে
> সাঁকো শূন্যমার্গে, বিহ্বল ছাগল গাধা
> উড়ে যায় গ্রামের মাথায়। ...
> শাদা কাফনের মতো। পাতায় পাতায়
> আমি মুহূর্তে বিনাশ দেখি আমারই সে
> নির্মিত গ্রামের।
> (সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩১-১৩২)

সময়ের প্রবহমানতায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা নানাদিকে বাঁক নিয়েছে। বাঙালি জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর আমাদের স্বাধিকার অত্যাচারী, সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণি দ্বারা বিপর্যস্ত হয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের এ ঘাত প্রতিঘাত শিল্প ও সাহিত্যে ব্যাপকভাবে উপস্থিত হতে থাকে। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর বাংলাদেশের সাহিত্য নবরূপে সৃজিত হতে থাকে। শিল্প স্রষ্টারা তাদের স্বদেশ এবং স্বদেশের নানা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। আইয়ুবি কালদশকের নিপতিত অন্ধকারে বাকরুদ্ধ সময় প্রবাহে বাংলাদেশের সৃষ্টিশীল সাহিত্যকেরা এ সময়পর্বে রূপক ও প্রতীকাশ্রয়ী জগতের মধ্যে আত্ম-উদ্ভাসন ঘটিয়েছেন। পঞ্চাশের দশকের অন্যতম কবি সৈয়দ শামসুল হক এ সময়কে ও সময়ের উত্তাপকে ধারণ করেছেন। চেতনার মর্মমূলে গ্রথিত করেছেন কবিতার পঙ্‌ক্তি। দৃঢ় প্রত্যয়

ও কাব্যবোধ তাঁকে মৌলিক ও সচেতন প্রতিভা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জাতীয় জীবনের দুর্মর মুহূর্তগুলো তিনি তুলে ধরেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়। কবি লেখেন:

আমারও কি তা-ই ছিল? শূন্য পরিণামে?
ব্যক্তিগত পর্দার বুনন পেনেলোপি
করেছিল। এই কুড়ি বৎসরের পরে
আমি কি বলতে পারি বলতে যা চাই?
বলেছি কি? আমার কবিতা বিবেকের
কণ্ঠ হয়? অবিনাশী সখা?

(সৈয়দ শামসুল ২০০৮: ১১৯)

সৈয়দ শামসুল হক তার সত্তর বছরের সৃজন বৈভবে সৃজনশীল শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তার সঙ্গে পঞ্চাশের দশকের কীর্তিমান চিত্রশিল্পীদের যে সখ্য গড়ে উঠেছিল তা অনিন্দ্য। পঞ্চাশের দশকের শীর্ষ চিত্রশিল্পী আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর ও কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে তার সখ্য আমৃত্যু বজায় ছিল। অগ্রজপ্রতিম জয়নুল আবেদিন ও খ্যাতনামা শিল্পী কামরুল হাসান পঞ্চাশের দশক থেকে লেখক ও কবি সৈয়দ শামসুল হককে স্নেহ করতেন । সৈয়দ শামসুল হক কাইয়ুম চৌধুরীর চিত্রপট নিয়ে প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। কাইয়ুম চৌধুরীর সৃষ্ট নৌকার যে গলুইয়ের চোখ তা কবির কাছে হয়ে উঠেছিল ঐতিহ্য ভাবনা উজ্জীবনে ও জীবনের প্রভাবিত ছন্দে এক অনিন্দ্য সৃজন। কবিতা ও বিভিন্ন প্রবন্ধে সৈয়দ শামসুল হক সে কথা বহুবার বলেছেন। কবির ভাষ্য:

তার জানালায় অন্ধকার ছক দেখে
ফিরেছ আবার। স্টেডিয়ামে কিছুক্ষণ
দাঁড়িয়ে একাকী কাইয়ুমের সন্ধানে
গেছ মালিবাগে। অসমাপ্ত চিত্র তার
দিয়েছে আশ্রয়। দোমড়ানো টিউবের
মতো অবিরাম এপাশ ওপাশ করো
আর শব্দ সহজে আসে না।

(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৩৮)

কবি সৈয়দ শামসুল হক একজন জীবনদ্রষ্টা। তাঁর কাব্যে নাগরিক মধ্যবিত্তের অসহায় বৃত্তাবদ্ধ দিনাতিপাত, টানাপড়েন, অস্তিত্ব অভীপ্সার চিত্র যেমন আছে তেমনি প্রান্তিক ভাসমান চরিত্র চিত্রনে তাঁর সাফল্য অনবদ্য। কোথাকার কোন বুড়ো কবিরাজ যে কিনা বাসকের ছাল খুঁজে ক্লান্ত, ভিখিরি, বারবনিতা এসবের বর্ণনায় কবি অবিরল কথক। সংলাপধর্মী পরিচর্যারীতিতে বর্ণনা করেন প্রান্তিক মানুষের জীবনযাপন, সৃষ্টি করেন কাব্যকলা।

গালবাদ্য করি সুরা পেটে গেলে পর,
বেশ্যাকে বসাই কোলে। বলে সে হঠাৎ,
'মিয়াভাই, কী জিগান হাবিজাবি, বাতি
নিবাইয়া দেই, না, বাতি থাকব কন।
আমার ব্যারাম নাই, নিশ্চিন্তে করেন।'
(সৈয়দ শামসুল ২০০৮: ১২২)

বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা কাব্যটি ব্যক্তিজীবনের পটভূমিতে নাগরিক মধ্যবিত্তের একঘেয়ে জীবনযাপন, সাধারণ অবক্ষয় ও অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করে। ব্যক্তিজীবনের অপরিসীম বেদনাবোধ বৃহৎ প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত হয়। এ গ্লানিময় হতাশার অবস্থা জীবনের নতুন এক তাৎপর্যকে অনাবৃত করে, মহৎ সম্ভাবনা নির্ণীত হয় সেখানে। জীবনের সামূহিক গ্লানি এবং সমাজের নৈরাজ্য-নৈরাশ্য থাকা সত্ত্বেও সৃষ্টিশীল জীবনবৈভবকে গভীরভাবে আকড়ে ধরার ইচ্ছা জাগে স্রষ্টা কবির মননে চিত্তে। কবি প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় লীন হতে চান, বার-বার বাংলার বুকে ফিরে আসার বাসনাকে জিইয়ে রাখেন। কবির ভাষ্য:

তবু আমি বারবার সাধবো কবিতা
গ্রীষ্মের চাতালে, শীতরাত্রির পাথারে,
বিপন্ন বর্ষায়, প্রতি বসন্তে বিভ্রমে,
বিপুল শহরে আমি হেঁটে হেঁটে যাবো
শব্দের প্রদীপ হাতে অক্লান্ত, নিয়ত।
... ...
আবার উঠব জেগে খরচৈত্রে চর
হয়ে তোমার পদ্মায়। পিঙ্গল জটায়
স্রোতের প্রপাত নিয়ে হেঁটে যাবো আমি,
স্মৃতির সাগরে। জন্মে জন্মে বারবার
কবি হয়ে ফিরে আসব আমি বাংলায়।
(সৈয়দ শামসুল, ২০০৮: ১৪১-১৪২)

কবিতা সমগ্র-এর দ্বিতীয় খণ্ডের মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে কবি বলেন:

> বেঁচে থাকতে চাই দীর্ঘ দিন কবিতার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্য। কত কথা এখনো রয়ে গেছে না বলা, কত কথা এখনো আছে আসবার, তারা আসছে অক্ষরপাত্রে তাদের ধরে ফেলবার মুহূর্তেই নতুনতর আরো কত কথা এসে মধ্যরাতে এখনো তো আমাকে জাগিয়ে দিচ্ছে আমি যে জেগে উঠতে পারছি আনন্দ এখানেই। (সৈয়দ শামসুল ২০০৯, প্রসঙ্গ কথা)

বৈশাখে রচিত পঙ্ক্তিমালা কাব্যটির শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও গঠনকাঠামো যেমন গতির অনিবার্যতা ও সাবলীলতা, নাটকীয় প্রকাশগুণ, শব্দ ও চিত্রের প্রত্যক্ষতা, তেমনি এর ধ্বনিসুষমা কাব্যটিকে অনন্য করেছে। নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এটি এক অনবদ্য সৃজন ও উল্লেখযোগ্য কাব্যপ্রয়াস। সমালোচক বলেন:

> *একদা এক রাজ্যের* ব্যক্তিক জগত থেকে *বৈশাখে রচিত পঙ্ক্তিমালা* সমষ্টির জগতে সংলগ্নতা সমাজ মানসের বিকাশের সঙ্গে সমান্তরাল ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। (সাঈদ, ১৯৮৬: ২৫১)

বাংলাদেশের কবিতায় চল্লিশের দশকের চেয়ে পঞ্চাশের দশক বেশি গুরুত্ব বহন করেছে। শিল্পসৃজনে তৃষ্ণামুখর পঞ্চাশের কবিরাই মূলত বাংলাদেশের কবিতার গোড়াপত্তন করেছেন প্রকাশকলা ও আধুনিক কবিতার নতুন সম্ভাবনার নিরিখে। সৈয়দ শামসুল হক সেই প্রতিভাবান লেখকদের একজন। ব্যক্তিমানুষের আস্তিত্বিক বেদনার অনুসূক্ষ্ম ও অন্তর্মুখী রূপটি বিম্বিত করার পাশাপাশি জৈববাসনা-রূপতৃষ্ণা-প্রেমপ্রত্যয় সর্বোপরি বাসনাবর্ণিল মনোজগৎ ও বাস্তবিক জীবন প্রতীতি অঙ্কন করেছেন। আধুনিক কবিতার সারভূত উদ্দীপনা এবং রসোচ্ছ্বাসের শ্রেষ্ঠতাকে ধারণ করেছেন কবি। তিনি তাঁর একাধিক লেখায় কবিতার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং নিরীক্ষাধর্মিতার কথা উল্লেখ করেছেন। সৃজনশীল প্রাণধর্মের আন্তর্তাগিদ থেকেই তিনি কবিতাকে নতুনভাবে নির্মাণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। কখনো কবিতাকে গদ্যের মতো ব্যবহার করেছেন আবার কখনো মুখের উচ্চারণভঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে গন্ধ-স্পর্শ-দৃষ্টির সংবেদনা; কল্পনা প্রতিভার মেধাবী সম্প্রকাশ। ধ্বনিকে নতুন মাত্রায় অবলম্বন করেছেন, আঞ্চলিক শব্দ, ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। পয়ার, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত ছন্দে আবার কখনো ক্ষুদ্র কবিতা দীর্ঘ কবিতা এবং গাথা নির্মাণ করেছেন। অক্ষরবৃত্তের পুরনো ধারা অর্থাৎ পয়ারের মাত্রা নিয়ে তিনি সৃজন করলেন সম্পূর্ণ কাব্য *বৈশাখে রচিত পঙ্ক্তিমালা*। প্রখর সমকাল সচেতন কবি চৌদ্দ মাত্রার অন্ত্যমিল নিয়ে এই কাব্যে আধুনিক ব্যক্তিমানসের সাময়িক জীবন যন্ত্রণা; নির্জিত বিক্ষত চিত্তের আকুলতা ও সামাজিক পট পরিবর্তনের নিখাদ চিত্রপ্রতীতি অঙ্কন করেছেন। জীবনাভিজ্ঞতার প্রজ্ঞান এই কাব্যটি অবিরাম আন্তর অভিজ্ঞতা-অভিব্যক্তি ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনার দরুন হয়ে উঠেছে কবির আত্ম প্রতিবেদন। সমালোচক মন্তব্য করেন:

> জীবনচেতনার গভীরতায়, প্রাতিস্বিক বোধজাত অনুভবে, নিজস্ব শিল্পরীতিতে, প্রকরণ নিরীক্ষার সহায়তায়, তাঁর কবিতার নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়েছে। শব্দ বিন্যাসে, ধ্বনি ঝংকারে, গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনায় তাঁর কবিতা মানবের শাশ্বত সংবেদকে প্রকাশ করেছে। তিনি দীর্ঘ সময়ের পটভূমিতে নিজের অস্তিত্বচেতনা ও অনুভবকে নব আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। (মোস্তফা, ২০০৮: ১৩৮)

সাহিত্য সৃজনের অনন্য পুরুষ সৈয়দ শামসুল হক একজন সার্বক্ষণিক সাহিত্যিক শৈল্পিক রূপরসের স্রষ্টা, মনে প্রাণে সাহিত্যিক বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই। শিল্পসৃজনের তৃষ্ণাবেগে জারিত কবি সৈয়দ শামসুল হকের প্রথম কাব্যগ্রন্থটি যে ধরনের ভাবনাজাত ফসল; কাব্য পরিক্রমায় সেই অবস্থান থেকে ক্রমে তিনি মানুষের সর্বজনীনতাকে বয়ন করেছেন। ভাবনার বিচিত্রগামিতার জন্যই মূলত তা সম্ভব হয়েছে। আহৃত শিল্পোপকরণের সমন্বয় ঘটিয়ে সৃজনীবৃত্তির আনন্দানুভূতিজারিত কবি জীবনাভিজ্ঞতার নান্দনিক আত্মপ্রতিবেদনটি ধারণ করলেন *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*'য় তা অনবদ্য। বাংলাদেশের সামাজিক,রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক পরিবর্তন যা স্বাভাবিকভাবে ঋণাত্মক তা বাসনাবিদ্ধ ব্যক্তি বেদনার নৈঃশব্দ্যে জারিত কবির অন্তর গহনকে কিভাবে তৈরি করে নেয় নিজের সৃজনচঞ্চলমুখর জীবন, সেই সম্পূর্ণ আবহে নির্মিত এ কাব্য। কবি নামক নান্দনিকবোধের সূক্ষ্মতা ধারণকারী মননশীল সৃজনীশক্তির হৃদয় পুরুষের আত্যন্তিক বোধ যন্ত্রণা বিবমিষার তীক্ষ্ণরূপ নিয়ে নির্মিত এ কাব্য। এই কাব্যে সৈয়দ শামসুল হকের আবির্ভাব ঘটে এক নব কাব্যপর্বে। এই কথা খুব সহজেই অনুমেয় যে, এ কাব্যে কবির সাথে যোগ দিয়েছিলেন কথাসাহিত্যিক সৈয়দ শামসুল হক; কেননা কাব্যটিতে কাহিনির আভাস আছে, আছে স্মৃতিময়তা, বর্তমান এবং পারিপার্শ্বিক সবকিছুই। পরবর্তীকালে কবি যে তাঁর অমর সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক কাব্যনাট্য রচনা করে অসাধারণ সৃজনক্ষমপ্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন তারও এক প্রকার সূচনা ঘটেছে কাব্যটিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আধুনিক বাংলা কবিতার নিরলস চর্চার ধারা এবং বিশ্বসাহিত্যের পঠন-পাঠন নিত্যদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি কবিতায়। অনেকটা চেতনাপ্রবাহরীতির প্রশ্রয়ে রচিত *বৈশাখে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা*কে সৃষ্টিশীলতার জ্যোতির্ময় উৎসারণ বলা যায় অবলীলায়।

গ্রন্থপঞ্জি

আজীজুল হক, ১৯৮৫। *অস্তিত্বচেতনা ও আমাদের কবিতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মোস্তফা তারিকুল আহসান, ২০০৮। *সৈয়দ শামসুল হকের সাহিত্যকর্ম*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ।

শামসুজ্জামান খান, ২০১৮। *পরানের গহিন ভিতরে সৈয়দ শামসুল হক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। সাঈদ-উর-রহমান, ১৯৮৩। *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক, ২০০০। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক, ২০০৫। *মার্জিনে মন্তব্য*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক, ২০০৮। *কবিতা সমগ্র-১*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক, ২০০৯। *কবিতা সমগ্র-২*, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।